OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 495 - 501
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও মূল্যায়ন

অজয় শীল শর্মা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ajaycob95@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Ramendrasundar Trivedi, Scientific consciousness, Elegant essays, Bengali intellect, Medium of scientific practice, Fundamental discovery, Bengali Science Essays.

Abstract
Ramendrasundar Trivedi was one of the foremost pioneers in developing a scientific temperament among the masses by writing elegant essays in the Bengali language. Not only in science, but his contributions to philosophy, society, religion, and literature also remain brilliantly alive in the minds of educated Bengalis. The quest for unity within the diverse Indian culture and the analysis of differences between the East and the West found a prominent place in his various essays. Therefore, Ramendrasundar Trivedi is an unforgettable name in the awakening of twentieth-century Bengali intellect. Looking at the life of Ramendrasundar Trivedi, it is evident that he deeply dedicated himself to both institutional and non-institutional education throughout his life. Consequently, it was only natural that his lifelong knowledge and experience would make his creative world richer and more diverse. However, despite being a student of science, Ramendrasundar did not make any fundamental scientific discoveries. This was because he truly believed that to understand science, observation, rather than mere rote learning, is necessary. Therefore, the widespread promotion and expansion of his scientific pursuits took place in the realm of literature. Ramendrasundar had a profound affection for the Bengali language. Making this very Bengali language the medium for practicing science is his unforgettable achievement. At a time when literary practice in Bengali was extremely difficult, Ramendrasundar presented complex, dry, and information-heavy subjects like science in a highly fluid manner in Bengali. This arduous feat of his is what makes us remember and reflect upon him today.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতক যুগান্তর সৃষ্টিকারী শতক। কারণ এ-সময় সাহিত্যে বহু নতুন শাখার জন্ম নিয়েছে। আর প্রতিটি শাখাই এক অভিনব রূপ নিয়ে নিজেদের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে। যদিও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্য তুলনামূলকভাবে অনাদরণীয়, তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙালি প্রতিভার যে দান তা যথেষ্ট প্রশংসা লাভের যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয় ভাবনার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একটি গৌরবময় আসন লাভ করেছে। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যে সকল প্রাবন্ধিকের পবিত্র হাতের স্পর্শ লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে রামমোহন রায়ের কথা। রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা আলোচনার বাহন করে তুলেছেন। তিনি মূলত ধর্ম ও তত্ত্বমূলক সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাঁর 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'ব্রহ্মোপসনা' (১৮২৮) ইত্যাদি যেমন ধর্ম বা তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় নিযুক্ত, তেমনি তাঁর 'সহমহরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' (১৮২৬) ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সামাজিক আচার-ব্যবহারমূলক আলোচনাকেই নির্দেশ করে। রামমোহনের পরবর্তী সময়ে বাংলা প্রবন্ধের রূপ ও রীতির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তা মূলত অক্ষয়কুমার দত্তের হাত ধরেই। অক্ষয়কুমার প্রবন্ধ সাহিত্যে নিয়ে এলেন বিষয়বৈচিত্র্য। তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, রাজনীতি, সমাজদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বৈচিত্র্য সাধন করলেন। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ বিচিত্র বিষয় ভাবনায় পরিপুষ্ট হলেও তাঁর লেখায় যে বিশুদ্ধ গদ্য ভাষার অভাব তার পূরণ ঘটে মূলত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ সাহিত্যে। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেই বাংলা প্রবন্ধ রচনায় ভাষা এক নতুন শক্তি অর্জন করে যথার্থ সাহিত্যধর্মী হয়ে ওঠে। এই পর্বেই মূলত দেখা মেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের। এরপর বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য নতুন মোড় নেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন অনমনীয় দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ সাহিত্যিক সরসতা। এই ধারারই অন্যতম প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিমপর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে চিন্তাধারা বা ভাবধর্মের আত্মপ্রকাশ সূচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর থেকেই তা নতুন ভঙ্গিতে আকারে ও রূপে প্রকাশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই নতুন ভঙ্গি ও রূপ নিয়েই আবির্ভাব ঘটে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। উনিশ শতকের দ্বীতিয়ার্ধে সরস, চিন্তাকর্ষক ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করেই মূলত প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। জটিল, নিরস বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে মনোজ্ঞ ভাষায় তিনি তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধই যেমন গভীর মননশীলতায় দীপ্তিময়, তেমনি কৌতুকরসের প্রসাদগুণে সরস ও উপভোগ্য হয়েছে।

রবীন্দ্র-যুগের মনস্বীদের মধ্যে অন্যতম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪–১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ)। মূলত বিজ্ঞানচর্চার জন্যই তাঁর খ্যাতি হলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ ভাণ্ডারকে নানাভাবেই সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলীর প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য থেকে। রামেন্দ্রসুন্দর রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী হন এবং অধ্যক্ষ রূপে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষাপ্রসারে যেমন তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সমাজের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তথা সামগ্রিকভাবে দেশ সেবায়ও ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। সমাজ সংস্কারে, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে, সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠায় কিংবা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা সমকালে বিশেষভাবে স্বীকৃত ছিল। সর্বোপরি সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ সমকালকে অতিক্রম করে যুগান্তরকে স্পর্শ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রেই যে সমধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এ সত্য অস্বীকার করাবার উপায় নেই। তবে রস-সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেননি। মূলত মননশীল রচনাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এমনকি বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নানা প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার টেয়াঁ বৈদ্যপুর গ্রামে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম। রামেন্দ্রসুন্দরের বাবা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী গণিত ও মহাকাশ বিষয়ে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম চন্দ্রকামিনী দেবী। ছোটবেলায় রাত্রে আকাশের তারা দেখানোর জন্য বালক রামেন্দ্রসুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে যেতেন তাঁর বাবা। পরিবারের মধ্যে বিদ্যানুরাগের চর্চা থাকায় ছোটবেলা থেকেই বিদ্যা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। গণিত প্রিয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্কুল জীবনে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বহু প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিভিন্ন বৃত্তিসহ প্রথম স্থান লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় মূলত ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে পদার্থবিদ্যা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও রসায়ন শাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে। যদিও পরবর্তী ছয় মাসে তিনি স্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু ঐ কলেজেই শিক্ষকতা করেন। ১৯০৩ সালে তিনি ঐ কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক হলেও রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু কোনো মৌলিক আবিষ্কার করেননি। তবে তাঁর বিজ্ঞান সাধারণকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তিনি প্রবন্ধকে করেছেন হাতিয়ার। তাই দেখা যায় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বি.এ ক্লাসে পড়ার সময় তাঁর রচিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' প্রকাশিত হয় 'নবজীবন' পত্রিকায়। তারপর অবশ্য একে একে প্রকাশিত হয় আরও তিনটি প্রবন্ধ— 'মহাতরঙ্গ', 'জড়জগতের বিকাশ' ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব'। প্রসঙ্গত সেই সময় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষীরা 'নবজীবন'-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তবে 'নবজীবন' ছাড়াও 'সাধনা', 'দাসী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'মুকুল', 'উপাসনা', 'আর্যাবর্ত', 'ভারতী' ইত্যাদি পত্রিকাতেও তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তৎকালীন বাংলার বিজ্ঞাননুরাগী বহুশ্রুত বিশিষ্ট মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতে মুখ্যত কয়েকজন ইউরোপীয় বিজ্ঞান সাধকের অভিনব চিন্তা ও মতবাদ এক যুগান্তকারী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেলমহোলৎজ, কেল্‌ভিন, লাপ্লাস, হাক্সলী প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞান বিশারদগণ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। বিশ্বপ্রকৃতির বহুবিচিত্র রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে এইসকল বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত সাধনা বিজ্ঞানপ্রিয় মানুষ মাত্রকেই বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রবর্তিত মতবাদ বা তত্ত্বাদির ভিত্তিতে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি রচনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম সংকলন গ্রন্থ হল 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)। এই গ্রন্থে মূলত 'ভূবিদ্যা', 'জীববিদ্যা', 'জ্যোতির্বিদ্যা' বিষয়ক মোট চোদ্দটি প্রবন্ধ সংকলিত রয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই দেখা যায় প্রাবন্ধিক মূলত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদ ও তাঁদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি নিজস্ব যুক্তিবোধসহ আলোচনা করেছেন। 'সৌরজগতের উৎপত্তি' প্রবন্ধে দেখা যায় সৌরজগতের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে তিনি প্রধানত কেপলা, হেলমহোলৎজ প্রমুখ পদার্থবিজ্ঞানী এবং সৌরজগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ লাপ্লাসের অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া 'আকাশ তরঙ্গ', 'পৃথিবীর বয়স', 'জ্ঞানের সীমানা', 'প্রকৃত সৃষ্টি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতেও দেখা যায় সেই সময়ের বহু নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে প্রাবন্ধিক সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত পৃথিবীর বয়স নিয়ে প্রাবন্ধিকের একটি সরস মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না, জননী ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেই জন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব।"[১]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিজ্ঞান বিদ্যায় বাহ্যজগৎ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দুই প্রকার জগৎ অর্থাৎ ব্যবহারিক জগৎ ও প্রাতিভাষিক জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক তথা বিজ্ঞানী বেইন সাহেবের মন্তব্যগুলোর উপর আলোকপাত করেছেন। বাহ্যজগৎ বা জড়জগতের ধারণা দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বেইন সাহেবের একটি উক্তিকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন—

> "In regard to the Object-properties, all minds are affected alike in regard to the Subject-properties, there is no constant agreement."[২]

অর্থাৎ, এখানে 'Object-properties' বলতে সেইসব অনুভূতিগুলোকে বোঝায় যেগুলো বাইরের থেকে আসে; সাধারণ ভাবে বললে এগুলোকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বলা হয়। এগুলোকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের 'Objective World' বা 'External Material World' তৈরি করে নেই। বাংলায় যাকে 'বাহ্যজগৎ' বা 'জড়জগৎ' বলা হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক জগতের রূপ-রহস্য অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত, 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থখানি তারই সুনিপুণ আলোচনায় সুবিন্যস্ত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক জগৎ' প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে প্রাতিভাষিক জগৎ প্রতিটি মানুষের নিজস্ব জগৎ, তা প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষলব্ধ। এই প্রত্যক্ষ প্রাতিভাষিক জগতের যে অংশকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় সেটাই বাহ্যজগৎ। মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পর ব্যবহারে জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সাধনের জন্য তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, অতএব তা ব্যবহারিক জগৎ—

> "বিজ্ঞান-বিদ্যায় আলোচ্য বাহ্য জগতের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম। সন্ধানে চলিয়া দুই রকমে জগতের সন্ধান পাইয়াছি। একটা হইল, ব্যাবহারিক জগৎ অর্থাৎ কাজ-চালান জগৎ। আর একটা হইল, প্রত্যক্ষ বা প্রাতিভাসিক জগৎ, - পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে অর্থাৎ যাহাদিগকে ইতর-সাধারণ বলা যায়, সে মোটা শ্রেণীর মোটা চরিত্রের লোকে জীবনের কাজ চালাইবার জন্যেই ব্যাবহারিক জগৎকে মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়।"[৩]

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন এবং সেসবের উত্তর দেওয়ার কাজই করে থাকেন দার্শনিক। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই জ্ঞানমার্গের পথিক। অজ্ঞানতার আঁধারে আলো জ্বালানোই তাঁদের কাজ। বস্তুত জগৎ সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসাই উভয়ের পথ চলার প্রেরণা। একদিকে দার্শনিক জগতকে সামগ্রিকভাবে জানার চেষ্টা করেন এবং তার মূল্য নির্ধারণ করেন। অপরদিকে জগৎকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে বিশেষ বিশেষ বিভাগের ঘটনাবলীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেন বৈজ্ঞানিক। সহজ কথায় বলা যায়, তথ্য নিয়ে কারবার বৈজ্ঞানিকের; অন্যদিকে দার্শনিকের জ্ঞানচর্চা নিবদ্ধ হয় তত্ত্ব তৈরিতে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যেমন বিজ্ঞানমনস্ক, তেমনি একজন ভাববাদী দার্শনিক। জগতের বিচিত্র রহস্যের স্বরূপ নির্ণয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যেমন বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি দর্শনশাস্ত্র থেকেও মীমাংসা-সূত্র আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি যেমন বিজ্ঞানচর্চায় তৎপর থেকে মনীষিত্বের আসন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি দর্শনচর্চার ধারায় অংশগ্রহণ করে পাঠককে করেছেন পরিতৃপ্ত। তার চিন্তার গভীরে রসায়ন তাই নিবিড়ভাবে গেঁথে গেছে। এমনকি তিনি দর্শন বিষয়ে যা কিছু চিন্তা করেছেন, তার থেকেও সেই বৈজ্ঞানিক মনকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। ফলে পাঠক তার লেখায় পেয়ে যান ভিন্ন ধরনের স্বাদ। রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শনভিত্তিক প্রবন্ধগুলি তার বৈজ্ঞানিক মনোভাবে পুষ্ট হলেও কোনোটিতেই জাগতিক রহস্যের সার্থক মীমাংসা বা সমাধান সম্ভব হয়নি। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি এই জাতীয় ভাবনাকেই বহন করে। গ্রন্থটির অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির শুরুতে প্রাবন্ধিক যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার অবতারণা করেন প্রবন্ধগুলির শেষে তার কোনো সঠিক সমাধান মেলে না; পাঠকের মনে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটে। রামেন্দ্রসুন্দরের এই জাতীয় দর্শন ভাবনা নির্ভর প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'সৃষ্টি', 'সুখ না দুঃখ', 'জগতের অস্তিত্ব', 'আত্মার অবিনাশিতা', 'এক না দুই?', 'মুক্তি' ইত্যাদি। 'সৃষ্টি' প্রবন্ধটিতে তিনি বিভিন্ন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জগতে সুখ অধিক না দুঃখ অধিক— এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে রামেন্দ্রসুন্দরের 'সুখ না দুঃখ?' নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে যে কোনো সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায় না সেকথাও তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> "মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।"[৪]

পাশাপাশি 'জগতের অস্তিত্ব' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর সমাজে জগতের স্থিতি বা রূপাবয়ব সম্পর্কে যে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন—

> "যদি জগৎ থাকে, তবে উহার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এ কথাটারও আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। জগতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আত্মা জড়শক্তি দেশ কাল প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের এমনই একটা স্তূপ আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে যে, মানুষকে পথহারা ও আত্মহারা হইতে হয়। কেহ বলেন জগৎ এক, কেহ বলেন দুই, কেহ বা বলেন জগৎ বহু। কেহ বলেন জগৎ অনাদি, নিত্য; কেহ বলেন সাদি, সৃষ্ট।"[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিজ্ঞানের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আজীবন বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের সাধনায় ব্রতী ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ-রহস্যের মূলে পৌঁছানো অসম্ভব বুঝে তিনি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে বিজ্ঞানতপস্বী দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর জাগতিক বিষয়সমূহ, বিশেষত তাঁর চারপাশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তাঁর সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত বক্তব্য ছিল। তবে মনে রাখতে হবে তাঁর এই সমাজ ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিচালিত হয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালীর ভিত্তিতে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশ্বাস করতেন যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনার পিছনে রয়েছে কোনো না কোনো কার্যকারণ সূত্র। এই মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের মধ্যে থেকে তৎকালীন ভারতে প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-নীতিসমূহের উৎসের সন্ধান করেছেন। তাঁর সমাজ ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাই যথাসম্ভব অতীতের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই জাতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ ভাবনা কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার', 'বর্ণাশ্রমধর্ম', 'পরাধীনতা', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'রাষ্ট্র ও নেশন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'রাষ্ট্র ও নেশন' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন—

> "রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া নেশন্ উৎপন্ন হয়; রাষ্ট্র মাত্রেই নেশন্ জন্মে না। ইউরোপ খণ্ডে রুষিয়া প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্র; কিন্তু রুষীয় জাতিকে নেশন্ বলা যায় কিনা সন্দেহ।
>
> নেশন্ বলা যায় না; কেন না, রুষিয়া নামে মহারাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ন্ত্রী সর্ব্বতোমুখী রাজশক্তি। এই রাজশক্তি প্রজাশক্তির একবারে মুখাপেক্ষা করে না। প্রজাশক্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজশক্তিকে সমর্থন করে না।
>
> যেখানে রাজশক্তিতে ও প্রজাশক্তিতে এরূপ বিচ্ছেদ নাই, সেইখানেই নেশন্ মূর্ত্তিমন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইউরোপে ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্ম্মান এবং আমেরিকায় মিলিত রাষ্ট্রের প্রজাগণ নেশনের উৎকৃষ্ট উদাহরন।"[৬]

রাষ্ট্র ও নেশন সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ধরনের ভাবনা তাঁর সুচিন্তিত মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

এছাড়া, রামেন্দ্রসুন্দরের জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের চিরন্তন সাক্ষী তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রবন্ধখানি। প্রবন্ধটিতে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্বেষণ করে দেখেছেন দেশের সম্পদ বা সমৃদ্ধির মূল রহস্য ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য। যেখানে সেই ঐক্যের মধ্যে বিভেদ সেখানেই জাতির পতন; অর্থাৎ বঙ্গলক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যেতে মনস্থ করেছেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের কারণেও বাংলার লক্ষ্মী চলে যেতে উদ্যত। তাই বিচক্ষণ রামেন্দ্রসুন্দরের মনে হয়েছে, বাংলার লক্ষ্মীকে আটকে রাখার একমাত্র উপায় নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ না করা। বঙ্গভঙ্গের এই দিনটিকে তাই দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেছেন, অরন্ধন অর্থাৎ রান্না না করে হাতে রাখি বা হলদে সুতো বেঁধে বাংলার মেয়েরা ব্রত পালন করবে—

> "বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বল্‌ল না। হিঁদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখি বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।"[৭]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আজীবন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্র হিসেবে যেমন ছিলেন মেধাবী তেমনি শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন সম্মানীয়। বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য পড়তেও ভালোবাসতেন। শিক্ষা এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসাই তাঁকে সৃষ্টিশীল যাত্রায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই প্রেরণা থেকেই তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক থেকে পরিবর্তনের উপায় নির্দেশ করেন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। 'অরণ্যে রোদন', 'অবভিভাষণ', 'ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম', 'শিক্ষাপ্রণালী', 'লোকশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ যেমন শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ, তেমনি 'সাহিত্য কথা', 'মহাকাব্যের লক্ষণ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি তাঁর উন্নত সাহিত্যচিন্তারই পরিচয় বহন করে। 'অরণ্যে রোদন' প্রবন্ধে একজন যথার্থ শিক্ষাবিদের মতোই তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যে শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৈন্যবোধ দূর করে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রবৃত্তির বলাধান করে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্ফূর্তিসাধন করে তাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের দাসত্বের জন্য উপযোগী করে—

> "উহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষানীতি, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষণে সম্যক্‌রূপে সমর্থ করে।"[৮]

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন যথার্থ সমাজ হিতৈষী। সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাই বারবার তিনি ফিরে তাকিয়েছেন ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে। একজন যথার্থ ঐতিহাসিকের মতোই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ভারতের যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রগুলি পর্যালোচনা করে ভারতবাসীকে দিয়েছেন অমৃতলোকের আস্বাদ। বিশেষত বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝেছেন এগুলির মধ্যেই রয়েছে আদর্শ সমাজের বীজ। তাই তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে উঠে এসেছে সেই বেদাশ্রয়ী সমাজের কথা। রামেন্দ্র রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় দেখা যায়, আমাদের জাতীয় জীবনের যা কিছু বিশিষ্টতা, তার মূলভিত্তি যেসব প্রাচীন শাস্ত্র তাদের কথা না জানার জন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। সেই আক্ষেপের তাগিদেই তিনি প্রত্যেকটি শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন—

> "আমাদের দেশের পুরাতন কথা যে আমরা জানি না বা জানিবার যত্নও করি না এবং ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আমাদের পকশে আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত। এমন কি, আমদের জাতীয় জীবনের যে কিছু বিশিষ্টতা, তাহার মূল ভিত্তিরও আমরা সন্ধান রাখি না, এই জন্য বসিয়া আমরা আক্ষেপ করিতাম ও আমাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দিতাম। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া এই সন্ধানকার্য্যে সাহায্য করা উচিত, এই কল্পানাও সেই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।"[৯]

এর ফলস্বরূপ রামেন্দ্রসুন্দরের কলমে লিপিবদ্ধ হয়, 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র বঙ্গানুবাদ। মানুষের কর্মই জীবনের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে একথা বোঝাতে তিনি ফিরে গেছেন বৈদিক যুগে। সেখান থেকে নানা উদাহরণ টেনে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বৈরাগ্য নয়, মানুষের জীবনের আসল ধর্মই হল কর্ম। তবে বৈরাগ্যকে তিনি উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে, মানুষ যখন কর্মহীন হয়ে পড়ে তখনই নেমে আসে বৈরাগ্যের আবেশ। তাঁর ব্যাখ্যায় তাই হিন্দুধর্মের চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম হল সন্ন্যাস। তাঁর 'কর্ম্মকথা' গ্রন্থের 'মুক্তির পথ', 'বৈরাগ্য', 'জীবন ও ধর্ম্ম', 'স্বার্থ ও পরার্থ', 'ধর্ম্মপ্রবৃত্তি', 'যজ্ঞ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে তিনি ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রের নিরিখে কর্মের কথাই তুলে ধরেছেন।

আজন্ম লালিত বাংলা ভাষার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষাকেই বিজ্ঞানচর্চার বাহন করে তুলতে চেয়েছিলেন বরাবর। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে অধিক প্রসার ও ব্যাপক করতে হলে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা যে আবশ্যক তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভবেরই বহিঃপ্রকাশ তাঁর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধটি। এই পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি যেকোনো ভাষা থেকে সহজ-সরল, শ্রুতিমধুর ও সুনির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে রামেন্দ্রসুন্দর একদিকে যেমন বাংলা ভাষাকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে আরও সহজ-সরল এবং শ্রুতিমধুর করে তুলতে বাংলা ব্যাকরণ চর্চায় ছিলেন নিবিষ্ট। তাই দেখা যায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা থেকে প্রেরণা নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষা বা শব্দতত্ত্ব প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বাঙলা ব্যাকরণ', 'বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'কারক-প্রকরণ', 'না', 'ধ্বনি বিচার' প্রভৃতি 'শব্দকথা' গ্রন্থে সংকলিত বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক এই প্রবন্ধগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের সহজ-সাবলীল ব্যাখ্যাগুণে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-চর্চা বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে কতখানি ভাবিত ছিলেন তার প্রতিফলন ঘটেছে 'বাঙলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে। ভাষা সম্পর্কে তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় মেলে 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধটিতে; ভাষা রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনার জগতে কতটা ছাপ ফেলেছে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখা যেতে পারে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 495 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। ভাবের সহিত শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। ...শব্দ একটা সঙ্কেত মাত্র। পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্কেতটা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক অর্থে প্রয়োগ করিলেই জীবনযাত্রা চলিয়া যায় ও ভাষার উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।"[১০]

বাংলা ভাষাকে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের এই জাতীয় ভাবনা তাঁর রচনাকে করেছে আরও সমৃদ্ধ, সুমধুর ও সহজবোধ্য। তাই দেখা যায় প্রবন্ধের শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বদাই সহজপন্থা অবলম্বন করেছেন তিনি। বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুপাক বিষয়কেও রচনারীতির প্রসাদগুণে ও সরসতায় তিনি অত্যন্ত সহজপাচ্য করে তুলেছেন। হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে তত্ত্ব বা তথ্যের আলোচনা রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন এক বিরল শক্তির অধিকারী। তাঁর প্রবন্ধগুলি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিশেষত বক্রোক্তি সংযোজনের নৈপুণ্যে সরস ও পরিহাসোচ্ছল হয়ে উঠেছে। দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও তাঁর হাতে কিরূপ চিত্তাকর্ষক ও রমণীয় হয়ে উঠেছে, রামেন্দ্রসুন্দরের 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—

> "...আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়।"[১১]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ২০
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ২০৭
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ২৩৩
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ১৫৬
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ১৬৬
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৫৭, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪২২ পৃ. ৭৭
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৪৮৯
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৫৭, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪২২ পৃ. ১২০
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৫৭, পৃ. নিবেদন অংশ
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ১৩৬
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত): রামেন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিসৎ ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৩৬২